পরশুরামের কবিতা: পটভূমি ও বিস্তার

দীপক গোস্বামী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বা শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টিশীলতায় সাহিত্য-শিল্পের অন্য শাখাতেও বিচরণ করবেন, এটা নতুন কথা নয়। চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যশিল্পী বা অভিনেত্রীদের অনেককেই আমরা যেমন অন্য শিল্পচর্চা করতে দেখেছি, তেমনি সাহিত্যেও অনেক লেখক একই সঙ্গে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার বা কবি। এমন কী, তাঁদের কেউ কেউ ললিতকলারও সার্থক রূপকার। পৃথিবীর সব শিল্প-সাহিত্যেই এটি নিয়মিত ঘটে চলেছে। বাংলা সাহিত্যিকদের নিয়ে এই আলোচনায় আমরা অবশ্য সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথকে অন্তর্ভুক্ত করি না। কারণ তিনি এমন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, যিনি সাহিত্যে তো বটেই শিল্পের বিস্তৃত ভূমির যেখানেই স্পর্শ করেছেন সেখানেই নতুন সৃষ্টি পুষ্পপল্লবে ভরে উঠেছে। তাঁকে আলাদা করে রেখে বাকিদের কথা আলোচনা করতে গেলেও মহাভারত হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা সাম্প্রতিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা জয় গোস্বামী পর্যন্ত সেই একই শাখা পরিবর্তনের পর্ব-পর্বান্তর।

বর্তমান নিবন্ধের সূত্রে ফর্ম বলতে গদ্যকে আমরা স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে ধরছি না। নিজের শিল্পচিন্তা ও শিল্পীজীবনকে ব্যাখা করতে গেলে গদ্যই একমাত্র মাধ্যম। তাই নানা সময়ে গদ্য প্রায় সবাইকেই লিখতে হয়— কাউকে মূলত প্রবন্ধ রচনার কারণে, কাউকে বা অন্য প্রয়োজনে। লক্ষণীয়, গদ্য ছাড়া সাহিত্যে শাখা-পরিবর্তনের যে উদাহরণ আমাদের সামনে আছে, তাতে কবিতা থেকে গল্প উপন্যাস বা নাটক চর্চায় যত সাহিত্যকার এসেছেনে, অন্য শাখা থেকে কবিতা চর্চায় পরিবর্তনের হার সে তুলনায় নগণ্য। এটা বোধহয় সর্বজনীন সত্য। কেন, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে সংক্ষেপে এটুকু ভেবে নেওয়া যেতেই পারে যে, কবিতার নিজস্ব ভাষা, ব্যাকরণ, চিত্রকল্প— সব মিলিয়ে যাকে প্রকাশভঙ্গী বলা হয়, সেটি সাহিত্যের অন্য শাখা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেটা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পারদর্শিতার বিষয়, যা ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার বা নাট্যকারের কাছে আশা করা না যেতেই পারে।

প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক লেখকের মৌশাই হল রাজশেখর চর্চা। গত দশবছরের রাজশেখর গবেষণার ফসল তিনটি বই: পরশুরামচরিত, পরশুরাম উবাচ, পরশুরামের চতুঃরঙ্গ। dipswami@gmail.com

জীবনানন্দের অমোঘ উচ্চারণ স্মর্তব্য— 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' হতে পারে, তাঁদের উপন্যাস ছোটগল্প বা নাটকে কাব্যগুণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তবুও সেগুলোকে কবিতা বলা যাবে না। কারণ 'কবিতা শুধু ছন্দের কারুকাজ নয়, কবিতা শুধু প্রতিশ্রুতি বা পরিকল্পনার ঘোষণা নয়, যদিও এর সবই কবিতার বহিরাবয়বকে ধরে রাখে কখনো-কখনো। কবিতা হল তা-ই যার মধ্য দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকাকে গভীরতম আর ব্যাপকতমভাবে ছুঁয়ে থাকতে পারি আমরা। কবিতা হল তা-ই, যা আমাদের অধিচেতনা আর অবচেতনার সঙ্গে কেবলই যুক্ত করে দেয় আমাদের সময়ের চেতনাকে।'[১]

রাজশেখর বসু (পরশুরাম)-এর কবিতা প্রসঙ্গে এই প্রাক্‌কথনের কিছুটা প্রয়োজন আছে। কারণ মধ্যজীবন থেকে শুরু করে শেষজীবন পর্যন্ত লেখা তাঁর নিরানব্বইটি গল্পপাঠে পাঠক হিসাবে আমাদের যে বিপুল প্রত্যাশা তৈরি হয়, তার ভার ও ধার যদি তাঁর নামে ছাপা ত্রিশ-বত্রিশটি কবিতায় সে ভাবে খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। সচেতন ভাবে কাব্যচর্চা করার জন্যই কবিতা লেখার প্রয়াস সম্ভবত বাল্যবয়স ছাড়া কখনও তিনি করেন নি। 'বাল্য' কথাটাও অবশ্য তাঁর নিজের উক্তি থেকেই।[২] কিন্তু সে প্রয়াস যে করতেই হবে সে রকমও কি কোনও পূর্বশর্ত আছে? কবিতা তো সম্পূর্ণভাবেই 'হয়ে ওঠা', চেষ্টা করে ইট-কাঠ গেঁথে তৈরি করা কোনও নির্মাণ নয়। ফলে কোন্ নিয়ম লাগু হবে সেখানে? মায়াকভস্কিকে উদ্ধৃত করে একদা শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন— 'নিয়মভাঙার নিয়মই তাই কবির নিয়ম। তাই দিয়েই চিনে নিতে হয় নতুন কোনো কবিকে।'[৩] ফলে কাব্যমূল্য যাইই হোক, যে প্রসঙ্গে এইসব কবিতা লেখা হয়েছে, সেখানে তারা কতটা সার্থক সে অন্বেষণেই আপাতত মনোযোগ দেব আমরা।

২

রাজশেখরের জন্ম বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামের মামার বাড়িতে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মার্চ। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। বাবা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা-মহারাজার ম্যানেজার, সুতরাং রাজশেখরকেও দ্বারভাঙ্গায় চলে আসতে হয় সম্ভবত সাত বছর বয়সে।[৪] সেখানকার রাজ স্কুলে ১৮৯৫ পর্যন্ত পড়ে এন্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করেন এবং পরবর্তী দু'বছর ফার্স্ট আর্টস পড়ার জন্য পাটনায় চলে যান। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গাবাসের সময়ে লেখা বিভিন্ন রচনাই তাঁর বাল্য-রচনা।

সে সময়ে কী লিখেছেন, বলা শক্ত। কারণ কোনও লেখাই রাজশেখর নিজে সংরক্ষণ করেন নি। বড়োভাই শশিশেখরের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সে সময়ে গীতার বুকনি তিনি শশিশেখরকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দিতেন এবং শশিশেখরও সেগুলো অবলীলায় টাইমস অব ইন্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল ও পাইওনিয়ারে নিজের বলে চালিয়ে দিতেন। সেই সময়েও রাজশেখরের মৌলিক রচনা ছিল, তবে সেগুলি কাউকে দেখাতেন না। ছিঁড়ে

ফেলে দিতেন। 'ইন্ডিয়ান টিট বিট' ম্যাগাজিনে কী একটা লিখেছিলেন ছেলেবেলায়।[৫] তা সত্ত্বেও কালের কবল থেকে বিভিন্ন ভাবে কিছু লেখা উদ্ধার পেয়ে গেছে। কোথাও পুরো, কোথাও অংশ। সে সব নিয়েই আমাদের পাওয়া রাজশেখরের কবিতার ভাণ্ডার বা সঠিকভাবে বললে বাল্য-কবিতার ভাণ্ডার। রাজশেখরের একমাত্র কবিতা সংকলনের নাম— 'পরশুরামের কবিতা', অবশ্য তাতে কয়েকটি মাত্র কবিতাই আছে। এ ছাড়া পত্র-পত্রিকায় রাজশেখর বসুর নামেও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাই এর পর থেকে এই আলোচনায় রাজশেখর ও পরশুরাম নামদুটি সমার্থক বলে ধরে নিতে হবে।

আমরা জানি, বাল্য-কবিতার যুগ পার হয়ে মাঝের তিনটি দশক প্রত্যক্ষ সাহিত্য-চর্চা থেকে দূরে থেকে রাজশেখর সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেছেন বিয়াল্লিশ বছর বয়সে।[৬] তার পরে অনুরোধে বা আবদারে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন, সম্পাদকরাও তার বেশির ভাগ প্রকাশ করেছেন তাঁদের পত্রিকায়, কিন্তু কোনও কবিতাই জীবৎকালে তিনি গ্রন্থভুক্ত করার কথা ভাবেননি। তাঁর মৃত্যুর বছরেই সাতটি ব্যঙ্গ কবিতা, পাঁচটি অটোগ্রাফ এবং কন্যার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে লেখা আর একটি কবিতা নিয়ে এম.সি. সরকার প্রকাশ করেন 'পরশুরামের কবিতা'। ধরে নেওয়া যেতে পারে তখনও পর্যন্ত তাঁর বাল্য-রচনা সম্পর্কে প্রকাশকের কোনও ধারণা ছিল না। থাকলে সেগুলিও এই গ্রন্থভুক্ত হত।

রাজশেখরের বাল্য-রচনা সম্পর্কে কিছু বলবার আগে তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোটো বৌদি (ঠেট ভোজপুরীতে,'ভউজায়ী') সরোজিনীর কথা বলা প্রয়োজন। সরোজিনী রাজশেখরের অনেক কবিতা সংরক্ষণ করেছিলেন— অবশ্য পরবর্তীকালের পাঠক-পাঠিকার জন্য নয়, দেবরের কাব্যশক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর নিজের জন্যই।[৭] শশিশেখর লিখেছেন— "কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল। এলাহাবাদের তের বছরের ছাতু-খেকো দেশের মেয়ে (সরোজিনী) বাঙলা দেশের 'রাজশেখর' আবিষ্কার করেছিল ষাট বৎসর পূর্বে। শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত পিতা চন্দ্রশেখর, বিদুষী মাতা লক্ষ্মীমণি, দাদা, মাস্টারের দল, ক্লাস ফ্রেন্ডস কেউ বালক রাজশেখরের কবিতা চুরি করে পড়েনি বা তা থেকে ভবিষ্যৎ আবিষ্কার কিছু করেননি।[৮] কিন্তু সরোজিনী করেছিল কেমন করে?

"রাজশেখর লেখাপড়া করে, টেবিলে বসে কাগজ মুড়ে সুড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কাউকে শোনায়ও না কবিতাটা কেমন উতরাল। উঠে রেলের লাইনে বেড়াতে যায়। ঘোমটা দেওয়া সরোজিনী চুপিচুপি আসে, মোড়া সোড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পেট কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলে আরও খোঁজে, ... চারিদিকে চট করে দেখে নেয় শাশুড়ি ননদ গুরুজনে বা কৌতুকপ্রিয় স্বামী দেখচে কি না— বেচারি ভয়েই অস্থির পাছে কেউ বলে, ধরে ফেলে, 'বউ পদ্য পড়ছ—ছি!' তাতে আবার দেওরের পদ্য!"[৯] এরপর নিজের ঘরে গিয়ে স্বামী ঘুমোলে গভীর রাত্রে ল্যাম্প জ্বেলে, ডুমো ডুমো কাগজগুলো মাটিতে খুলে

হাত দিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলে। কবিতাগুলো মুখস্ত করে। তারপর প্যাক করে তোরঙ্গে পুরে ফেলে। সেই তোরঙ্গ নিয়ে যখন বাপের বাড়ি এলাহাবাদে যাওয়া হবে, তখন মোটা মোটা দুটো খাতায় সেগুলো কপি করা হবে সেখানে। শুধু সরোজিনীই নয়। "সরোজিনীর স্কুলের বান্ধবীরা দলে দলে এসে 'মেজ ঠাকুরপোর কবিতা' নিজেদের খাতায় কপি করে নিয়ে যেত। বাপ-মা-দিকে শোনাত। 'মেজঠাকুরপো' নাম এলাহাবাদে বাঙালীর বাড়ি বাড়ি চালু হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা নয়, খোট্টা দেশে বাঙালী মেয়ে-মহল উদ্ভাসিত করে প্রথমে এই বালকের নাম বিকশিত হল।"[১০]

কিন্তু এত যত্ন করে কপি করা সত্ত্বেও সে সব বাল্য-রচনা কিন্তু কোনদিনই পাঠকের গোচরে আসে নি। আসা সম্ভবও ছিল না। কারণ সংকোচ বশতই হয়ত সে কবিতা সরোজিনী সমবয়স্ক দু-একজন ছাড়া শ্বশুর বাড়িতে কাউকে দেখায়নি। দেবরের ফেলে দেওয়া লেখা চুরি করে কুড়িয়ে নেওয়া ও তার বিনা অনুমতিতে খাতায় কপি করা, এই ছিল তার সংকোচ। আর এই সংকোচ নিয়েই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময়ও স্বামীকে অনুরোধ করে গেছে— 'সব খাতা গঙ্গায় দিও'। হয়ত মনে করেছিল, গোপন করা জিনিস জলের মধ্যেই গোপনে থাক। তাকে তো কেউ ডিসকভারির জন্য বাহাদুরি দেবে না। সেই অনুরোধেই সরোজিনীর মৃত্যুর পর মোটা দু-খানা খাতা ভর্তি 'মেজ ঠাকুরপোর কবিতা' পাটনার গঙ্গাজলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে শশিশেখর কৌতুকের সুরেই আক্ষেপ করেছেন— "বালকের সাহিত্য ধ্বংস করায় আমার পাপ হল কি? তাতে আবার সে বালক সহোদর, ছোট বয়সে। না কি স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করে পুণ্য হল? আমি বড়ো ভাই না হয়ে যদি সাহিত্য ইতিহাসের পণ্ডিত হতেম ধমক-ধামক দ্বারা বা যাদু-বাছা বলে হয়ত 'মেজঠাকুরপোর কবিতা' ইংরেজি লেখকদের 'Early Poems', 'Fragments' ইত্যাদির মতন প্রকাশ করতাম আর তাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব হত।"[১১]

রাজশেখর (পরশুরাম)-এর কয়েকটি কবিতা বাল্য-রচনা হিসাবে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল ২০০৩-এ প্রকাশিত 'পরশুরাম গল্পসমগ্র'-এর শেষে কবিতাংশে। সম্পাদকের লেখা এই অংশের পরিচিতি থেকে জানা যায় যে ৯০/৯৫ বছর আগেকার একটি খাতা থেকে কবিতাগুলি পাওয়া গিয়েছিল। এই খাতায় সেগুলি কপি করেছিলেন রাজশেখরের বোনেরা।[১২] কয়েকটি কবিতার নীচে 'শ্রীরাজশেখর' নামও লেখা ছিল। হতে পারে, পার্শীবাগানে থাকাকালীন সরোজিনীর কাছ থেকেই কবিতাগুলি পেয়েছিলেন তাঁরা। বোনেদের মধ্যে কে বা কারা এগুলি কপি করেছিলেন এবং কিসের ভিত্তিতে এই চারটি কবিতাই নির্বাচন করা হয়েছিল, এত দিন পরে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুরূহ। তবে এগুলি মুদ্রণের ব্যাপারে সম্পাদকের কিছু সংশয় ছিল। রাজশেখরের নিজের হাতের পাণ্ডুলিপি না হওয়ায় সম্পাদক নিঃসন্দেহ হতে পারেননি যে এগুলি রাজশেখরেরই রচনা কি না। আশঙ্কা ছিল, প্রকাশের পরও হয়ত কেউ প্রকৃত রচয়িতার কৃতিত্ব দাবি করবেন। বিগত পনেরো বছরেও এই দাবি

না আসায় এগুলি রাজশেখরের রচনা ধরে নিয়েই আমরা আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

যে চারটি কবিতা নির্বাচন করা হয়েছিল, তাদের নাম— 'জল', 'নাবিক', 'সরস্বতী' এবং 'শেলির The Question হইতে অনুকৃত' (বোনেদের খাতায় কবিতার কোনও নাম ছিল না, নামকরণ সম্পাদকের)। সবকটি কবিতাই অনুর্দ্ধ ষোলো বছর বয়সে লেখা। নির্ভুল ছন্দে সুন্দর বর্ণনায় কবির স্ফুটনোন্মুখ কাব্যিক মনটা বেশ ধরা যায়। 'জল' কবিতায় বিভিন্ন জলের ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা পাঠককে অবাক করবে। সাধারণ 'তরল জল' থেকে শুরু করে 'চঞ্চল জল' 'শিশির জল' 'বারিদ জল' 'শীতল জল' 'নয়ন জল' এবং 'শোভন জল'-এ কবিতার সমাপ্তি। সাতটি অনুচ্ছেদের এই কবিতার দুটি বিচ্ছিন্ন অনুচ্ছেদকে আমরা পাশাপাশি রেখে দেখতে পারি।

'গভীর গরজে নভ নিনাদিত,
বিজলী আলোকে দিক উদ্ভাসিত।
প্রাবৃট আকাশে মেঘ বিগলিত,
সুখদ সুহৃদ বারিদ জল।।'...

'গভীর বিষাদে হৃদয় পুরিত,
শোক দুঃখ ভরে মানস দহিত।
তাপিত মানব হৃদি বিগলিত,
পাষাণ গলন নয়ন জল।।'

'নাবিক' কবিতাতেও জলের অনুষঙ্গ আছে, তবে সেটি আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশের পরিচিত জল নয়, কবির ভাষায় তা সুনীল সাগর নীর। সমুদ্রের তীব্র আকর্ষণ নাবিকদের নীল পাথারে টেনে নিয়ে গেছে। এখন দুরন্ত সাগরের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও কবির 'চলিয়া যাইতে প্রাণ নাহি চায়।' নাবিকদের মতই আকর্ষণের বশে তিনি সমুদ্রকেই হৃদয়ের সারবস্তু বলে মনে করেছেন—

'পদাহত হ'লে কোন কোন নর, আবার যাইয়া চরণ ধরে,
দেখেছ কি কভু ধরণী উপর মান লাজহীন এমন নরে,
তাহাদেরি মত হয়েছি আমরা, নীল জল সার করেছি হায়।
ভাঙ্গিয়া তরণী বহে জলধারা, ডুবে যাক্ তরী কি ক্ষতি তায়?'

'সরস্বতী' কবিতাটি বিদ্যাদেবীর বন্দনা। কোনও স্বতন্ত্র বক্তব্য না থাকায় শুধু কথার পর কথা সাজিয়ে বাক্‌কেই ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। ছন্দ-মিলের ধরনে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি পাঁচালির আশ্রয় নেয়।

The Question কবিতার অনুকৃতিতে শেলীর বিস্তারিত প্রকৃতি বর্ণনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত

করেছেন রাজশেখর—ফলে কাব্যরূপ অনেক সংহত হয়েছে। শেলির কবিতার প্রকৃতি বর্ণনায় বাঙালি পাঠকের অপরিচিত অজস্র ফুলের নাম, যাকে কোনও সমালোচক catalogue of wild flowers বলে উল্লেখ করেছেন, সংগত কারণেই অনুবাদে রাখা হয়নি।

There grew pied wind-flowers and violets,
Daisies, those pearled Arcturi of the earth,
The constellated flower that never sets;
Faint oxlips; tender bluebells, at whose birth
The sod scarce heaved; and that tall flower that wets–
Like a child, half in tenderness and mirth–
Its mother's face with Heaven's collected tears,'[১৩]

বঙ্গানুবাদে—

'বিকশিত কত কুসুম রতন
হরিত তটিনী পুলিন 'পরে
এ কুসুমমালা মুদেনা কখন
হেলেনা বিটপী কুসুমভারে
হেথা এক ফুল পড়েছে হেলায়
ঢালিছে শিশির পল্লব তরে
কাঁদে যথা শিশু আদরে ভাসায়
জননী বদন নয়ন জলে'

বালকের কাছ থেকে পাওয়া স্বাধীন অনুবাদের এরকম প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা পাঠককে বিস্মিত করে।

'পরশুরাম গল্পসমগ্র'-এ বাল্যকালের চারটি কবিতা ছাড়াও শশিশেখরের লেখায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতার অংশ পাওয়া গেছে। বালাবাহুল্য, সবই সরোজিনীর মুখে শোনা। পূজার থিয়েটার দেখে এসে রাতদুপুরে শশিশেখরকে ঘুম থেকে তুলে সে হাত নেড়ে অ্যাকট করতে লাগল—

'বিকশিত হেরি ফুলবন—কাননেতে
ধায় সমীরণ; কোমল পল্লব
কোলে হায়, ফুল কুলবনে লুকায়
ভাবে বায়ু, 'ফুটে নাই ফুল'।
ফিরে যায় হইয়া আকুল। কুসুমেরও
স্বার্থের ভাবনা!'

কবির নাম জিজ্ঞাসা করাতে সরোজিনী বলেছিল, 'শুনতেই তো পাবে একদিন শত সহস্র লোকের মুখে; আমি বলে কি করব?' দেবরের কবিতা চুরি করে রাখা এবং পড়ার বিপদ

সে জানত। সে আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেবার জন্যই হয়ত দেবরের কবিতাকেই আশ্রয় করে আওড়াত—

"বিপদ বারতা মানব চাহে না
কল্পিত স্বপনে সতত রয়
'হবে না হবে না' একথা ভাবে না
'হবে হবে' চাহে মানব হৃদয়।"

শশিশেখরের লেখা থেকে আরও জানা যায় রাজশেখর শেলির আরও একটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। শশিশেখরের জবানীতে— 'দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী অনুনয় বিনয় করে বল্লেন, 'শেলির আত্মহত্যার ইচ্ছাটা একবার আওড়ান না।' পত্নীর মুখে যেমন শুনেছিলাম আওড়ালাম— ।"[১৪] অর্থাৎ শেলির এমন একটি কবিতা অনুবাদ করা হয়েছিল, যাতে কবি মৃত্যু বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। শশিশেখরের আওড়ানো কয়েকটা পংক্তি শুনে মনে হয় মূল কবিতাটি সম্ভবত Stanzas Written in Dejection, near Naples, যার চতুর্থ অনুচ্ছেদে আছে—

'Yet now despair itself is mild,
Even as the winds and waters are;
I could lie down like tired child,
And weep away the life of care
Which I have borne and yet must bear,
Till death like sleep might steal on me,
And I might feel in the warm air
My cheek grow cold, and hear the sea
Breathe o'er my dying brain its last monotony.'[১৫]

এই অংশের ভাবানুবাদের একটি টুকরোই সম্ভবত শশিশেখর আওড়েছিলেন—

ধীরে বহে যাবে মৃদুল পবন
হেরিব চৌদিকে নীল পাথার।
শুনিতে শুনিতে সাগর গর্জন
ত্যজিব অন্তিম নিঃশ্বাস ভার।

প্রকৃতির পরিবেষ্টনে মৃত্যু-বাসনার বর্ণনাতেও বালক কবির পক্ষে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে।

৩

সরোজিনীর কাছ থেকে শোনা বা বোনদের নকল করা কবিতা ছাড়া রাজশেখরের নিজের হাতে লেখা কোনও বাল্য রচনা এখনও দেখা যায় নি। এরকম কবিতা প্রথম পাওয়া গেল উনিশ বছর বয়সে (৬ এপ্রিল, ১৮৯৯)। এ বছরই তিনি কেমিস্ট্রিতে এম.এ পাস করেন।

কবিতাটির নাম— 'জামাইবাবু ও বউমা', লেখকের নাম হিসাবে লেখা হয়েছিল— By a Veteran। ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ পাস করার বছরেই রাজশেখরের বিয়ে হয়ে গেছে কলেজ স্ট্রিটের অভিজাত পরিবারে— বিদ্যাসাগর-সুহৃদ শ্যামাচরণ দে-র পৌত্রী মৃণালিনীর সঙ্গে। দু-বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজেকে Veteran বলা যায় কিনা, সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় ইতিমধ্যেই যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, সেটা প্রবীণদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।[১৬]

এটি দীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতা। শুরুতেই কবির নির্দেশ ছিল— 'ন্যাকা ন্যাকা সুরে পড়িতে হইবে।' কলকাতার এক কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রের পড়াশোনা উপেক্ষা করে বউয়ের টানে হাওয়া বদলের নামে পশ্চিমের কোনও শহরে যাত্রা এবং সেখানে শ্বশুর বাড়ির অন্তঃপুরে মহিলাদের আদর আপ্যায়ন শেষে বিয়ের পর পত্নীর সঙ্গে প্রথম দেখা— এই নিয়ে কবিতা। আদ্যন্ত ব্যঙ্গের মোড়কে ঢাকা এই কবিতায় বাস্তব জীবনের এমন উপাদান আছে, যা পরবর্তীকালে পরশুরামের গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন মন্তব্য আছে, যার দার্শনিকতা গম্ভীর প্রাবন্ধিক রাজশেখরকেও সংযুক্ত করে।

আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত রচনাটির সূত্রপাত বউমা-জামাইকে এই কাব্য উৎসর্গ করে—

'পৃথিবীতে আছে নানাবিধ সঙ্
নানাবিধ সাজে করে কত ঢঙ্;
তাঁহাদের চাঁই বউমা জামাই,
তাঁদেরি চরণে দিনু এ ডালি।'

বউ-এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে কয়েকটি সরল উদাহরণে—

'বউ আর পড়া আদা কাঁচকলা,
বউ কাঁচপোকা পড়া আরশোলা।
পড়া কেলে হাঁড়ি বউ মোটা লাঠি
লেখা পড়া সব বউ করে মাটি।—'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে এক দীর্ঘ রেলযাত্রার বর্ণনা আছে। শ্বশুর বাড়ি পৌঁছবার জন্য জামাইয়ের অস্থিরতা। হুগলি, বর্ধমান, রানীগঞ্জ, আসানসোল, মধুপুর, মোকামা পার হয়ে বক্সারে ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্টে পেঁয়াজসহ গরমগরম মটন কারি। বোঝা যায়, আজ থেকে প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে বাঙালি হিন্দু যুবকরা সমাজের ভয়ে নিষিদ্ধ মাংসটুকু বাদ দিয়ে রেস্টুরেন্টের যে কোনও খাবার যে-কোনও সময়েই খেতে আপত্তি করত না—

'হিন্দু হ্যায় হম্— বীফ নেহি খাগা,
খানা খাগা কিন্তু জাত নেহি দেগা।
মটন্ লে আও, বীফ নেহি খাতা,

কাহে তুম কহা অলক্ষুণে কথা?
যাতা হ্যায় হম্ শ্বশুর বাড়ি।'

অবশেষে শ্বশুর বাড়ির স্টেশনে রেলযাত্রার সমাপ্তি এবং শ্বশুর ও শালাদের সঙ্গে ফিটনে করে বাড়ি পৌঁছনো। শ্বশুর বাড়ি যাত্রার এই অংশ পর্যন্ত রাজশেখরের নিজের অভিজ্ঞতার চেয়ে বড়োভায়ের অভিজ্ঞতা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। নিজের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা তো পার্শীবাগান লেন থেকে পটলডাঙা। আর শশিশেখরের শ্বশুরবাড়ি এলাহাবাদ— যাত্রাটা দ্বারভাঙ্গা থেকে এলাহাবাদ। শশিশেখর লিখেছেন— 'আমি এলাহাবাদ যেতাম ও কর্ড-মেলের গল্প করতাম। সেও চড়ে, কর্ড মেলের স্বাদ পেয়ে রেল রেল আগ্রহ দেখাল। কবিতায় কর্ড মেলকে বড় করল।'[১৭] ... বোঝা যায়, শশিশেখরের চিঠি ও বর্ণনাই এই কবিতায় রেল-যাত্রার উৎস।

পরবর্তী অংশ অবশ্যই নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ। বিরাট যৌথ পরিবারের জামাই হিসাবে এটি সংগ্রহ করতে হয়েছে বয়জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ নানা সম্পর্কের আত্মীয় কুটুম্বদের সংস্পর্শে এসে। নতুন জামাইয়ের প্রতি শালী-শালাজদের আদরের ঘটা দেখে কবির মনে হয়েছে—

'এ আদর আর কত দিন রবে?
চিরস্থায়ী সুখ নাহি কভু ভবে।
নূতন জামাই এলে পরে হায়
পুরানো জামা'য়ে এঁড়ে লেগে যায়।'

জামাইয়ের মতো স্ত্রীদেরও দুঃখ থাকে। তারাও মনের মতন স্বামী পায় না। সে স্বামী কেমন? মনের মতন বর বলতে বউরাই বা কী বোঝে?

'মাটির ঢিপির মত হবে বর,
কথা নাহি কবে কথার উপর।
যে দিকে ফিরাব সে দিকে ফিরিবে,
লাথি মারিলেও চরণে ধরিবে।—'

আর এই দুঃখ বেদনা অভিমান অহংকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হতে থাকে। ঘন ঘন ভাব বা আড়ি হয় না, বার বার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, না হলে চিঠি লেখা— এ সবই হারিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় দাম্পত্যের অন্তরঙ্গতা। মনে প্রশ্ন নিয়ে কবিতা শেষ হয়—

'প্রণয়ের কিরে এই পরিণতি?
বুড়া বয়সেতে হায় কি দুর্গতি।'

কম বয়সে লেখা সংস্কৃতে এরকম আর একটি ব্যঙ্গ কবিতা—'পুত্তলিকা বিবাহ পদ্ধতিঃ', যা টুকরো ছেঁড়া কাগজে পাওয়া গিয়েছিল।

'শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ সাহেবৈর্নির্ম্মিতস্য গৃহীতস্য পুত্রস্য
পোর্সিলেন গোত্রস্য শ্রীমতঃ অমুকস্য শ্রীমত্যা অমুকয়া

সহ বিবাহকর্ম্মাহং করোমি। ভাস্করে মাসি তস্করে
পক্ষে ছুট্যাং তিথৌ খেলালগ্নে গণ্ডগোলযোগে ইদং
শুভবিবাহকর্ম্ম সম্পাদয়তু। পরিণাম ফলং কন্যায়াঃ
নাসিকাভগ্নং পুত্রস্যতু মুণ্ডপাতং অন্তে পুষ্কর্ণ্যাং
বিসর্জ্জনং। শুভাশুভং যদ্রোচিতং তদস্তু। ইতি।'

অবশ্যই এরকম ব্যঙ্গ কবিতা বেশ কয়েকটি আছে। অনেকগুলিরই কোনও নামকরণ করা হয় নি। কবিতাটুকুই পাওয়া গেছে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সাহিত্য ও প্রযুক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে প্রযুক্তির অগ্রাধিকারকে সুন্দর ব্যঙ্গ করা হয়েছে নীচের কয়েক লাইনের কবিতায়। যে সব প্রয়াসে অর্থনৈতিক পরিবর্তন নেই, সে সব প্রচেষ্টায় দেশের গুণীজনেরও কোনও উৎসাহ নেই— বরং ঐতিহ্যের প্রশ্ন তুলে বাধাদানের চেষ্টা আছে। আর যদি কোনও কারণে তা অর্থনীতিকে পোষণ করে, তবে তার প্রতি সাধারণজনের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকে এবং ধনীজনের আর্থিক সহায়তা।

শেক্স্পীয়ারের নাটক পড়িয়া
পাঠক বলিল— ধন্য ধন্য।
পণ্ডিত কহে— সবুর করহ,
শোধ করিব ত্রুটি অগণ্য।
যষ্টি তুলিয়া বলে সুধীজন—
কি আস্পর্ধা ওরে জঘন্য।।

স্টিফেনসনের রেলগাড়ি চ'ড়ে
যাত্রী বলিল— কি আশ্চর্য!
মিস্ত্রী বলিল— আছে ঢের দোষ,
সারিব সে সব, ধরহ ধৈর্য।
ধনী জন কহে— লেগে যাও দাদা,
যত টাকা লাগে দিতেছি কর্জ।।

অন্যান্য ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে আরও দু-টির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন— একটি 'চন্দ্র সূর্য বন্দনা' এবং অন্যটি 'ঘাস'। প্রথমটি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা কবিতা, কিছুটা তাদের ভাষাতেই। শিশুসাহিত্যে রাজশেখরের অবদান সচরাচর চোখে পড়ে না বলে এই রকম দু-একটি কবিতাই শিশুদের কাছে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। দিন ও রাতের সূত্রে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্য কার প্রয়োজনীয়তা বেশি এই নিয়ে বিভিন্ন লেখক কবিরা চিরদিনই কাল্পনিক প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষত অন্ধকারে আলো দেওয়া চাঁদ শিশুদের কাছে মহিমান্বিত হয়েছে। মোল্লা নাসিরুদ্দীনের প্রচলিত গল্পেও এই প্রসঙ্গ এসেছে। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে কার

প্রয়োজন বেশি— জনৈক ব্যক্তি মোল্লাকে এই প্রশ্ন করলে, নাসিরুদ্দীন তার পরিচিত পদ্ধতিতে উত্তর দেন— 'আরে, সূর্য তো দিনের বেলায় ওঠে, যখন চারিদিকে আলো থাকেই। কিন্তু চন্দ্র এমন সময় আলো দেয়, যখন চর্তুদিকে অন্ধকার— চন্দ্রই নিঃসন্দেহে বেশি মূল্যবান।'[১৮] 'চন্দ্র সূর্য বন্দনা' কবিতার প্রথম অংশটি মোল্লা নাসিরুদ্দীনের চিন্তা অনুসারী। কিন্তু তার পরও শিশুর ভাবনায় এক নতুন মোচড় আছে।

'তবে লোকে সূয্যিকে কেন চায়?
কবিরা বলেন বটে— জ্যোৎস্নায়
ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয় তেন হয়,
কিন্তু কচি ছেলের কাঁথা কি চন্দ্রালোকে শুখয়?
আমসত্ত্ব ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম,
এসব শুখোনো কি চাঁদের কম্ম?
আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দুর,
তার জন্য চাই কাঠফাটা কড়া রোদ্দুর।'

লক্ষণীয়, সূর্যের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থনের যুক্তি শিশুমনে কীভাবে তৈরি হচ্ছে। কচি ছেলের কাঁথা শুখোনো, আমসত্ত্ব, ঘুঁটের মত পরিচিত অনুষঙ্গ শিশুর জগৎটাকে মনে পড়িয়ে দেয়। এমন কী অপরিণত উচ্চারণে 'কাঁচা চম্ম' (চর্ম নয়) নিশ্চয়ই শুধুমাত্র 'কম্ম'-এর সঙ্গে অনুপ্রাসের জন্য ব্যবহার করা হয় নি। প্রসঙ্গত, চাঁদ নয়, অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের আলোক বিতরণের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন 'ফাল্গুনী' নাটকে দাদার চৌপদীর মাধ্যমে। যদিও সেখানে সমস্যাটা দিন রাত্রির অনুষঙ্গে নয়। দাদার মতন প্রখর বাস্তববাদীর চৌপদীতে সেটার কাল্পনিক রূপ— রাত্রে তারকাদের অকারণ আকাশে আলোক বিতরণ করা উচিত না মাটিতে। দাদার ভাষায়—

'অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে।
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে।
মর্ত্যে এলে কর্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।'[১৯]

এইসব কবিতার সমসাময়িক কালেই তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন হল। ব্যঙ্গে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ ইত্যাদির ছাপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে থাকল। সামাজিক চাহিদার সঙ্গে যে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাও ধরা পড়ল এই সব কবিতায়। এই রকম একটি ব্যঙ্গ কবিতা— 'হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র', লেখা হয়েছিল ১৯৪৬-এ। ১৯৪৩-৪৪ সালের মন্বন্তর অর্থাৎ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' পার হয়ে বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তখন নিতান্তই ভয়াবহ। সরাসরি এখনে না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্যোগের ছায়া ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মন্বন্তরের ফলে খাদ্যসংকট ও মন্বন্তর-পরবর্তী মহামারীতে

প্রায় ২১ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়েছে। তথাকথিত মন্ত্রী ও অসৎ আমলাদের কুশাসনে সরকারী ব্যবস্থা দারুণভাবে বিপর্যস্ত। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পরশুরামকে সরাসরি এসব কথা বলতে হবে 'রামরাজ্য' (১৯৪৯) গল্পে। যেখানে সুবোধবাবুর বাড়ির সান্ধ্য-সেঁয়াসে যোগ দেওয়া বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসবে— 'অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, ধর্ম নেই, সত্য নেই, ত্যাগ নেই, তপস্যা নেই'; 'বিলকুল চোর, ডাকু, লুটেরা, কালাবাজারুয়া, গাঁঠ-কটেয়া'; 'পুঁজিপতির অত্যাচার, সর্বহারার আর্তনাদ, জুলুম, ফাসিজম্, ধাপ্পাবাজি, কথার তুবড়ি...' ইত্যাদি।[২০] ফলে অসৎ মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে অপসারণ করার জন্য হবুচন্দ্র রাজাকে উদ্দেশ্য করে জনসাধারণকে বলতেই হয়—

'যদি না পারেন রাজার কাজ
তবে কি করতে আছেন মহারাজ?
চ'লে যান, আপনাকে আমরা চাই না।।'

কিন্তু রাজার রাজত্ব তো চলে মন্ত্রীর কূটনীতিতেই। তাই গবুর শিখিয়ে দেওয়া জবাব হবুচন্দ্র রাজা আওড়ে যান—

'ওহে প্রজাবৃন্দ শান্ত হও, ধৈর্য ধর,...
তোমাদের নালিশ মিথ্যে আদ্যন্ত,
স্বয়ং গবুচন্দ্র করেছেন তদন্ত।'

এই জন্যই আরও পরে রাজশেখরকে লিখতে হয়েছে— 'এখন তাদের [আমলাদের] জুলুম বেড়ে গেছে, উপরওয়ালাদের বললেও কিছু হয় না, তারা নিম্নতনদের শাসন করতে ভয় পান।'[২১]

এই রকমই আরেকটি কবিতা 'ঘাস'। ১৯২৫ সালে পরশুরাম তাঁর বিখ্যাত গল্প 'বিরিঞ্চিবাবা' লেখেন। তার একটি চরিত্র প্রফেসার ননি ঘাসের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্নাভাব দূর করতে চেয়েছিল। পদ্ধতিটা নাকি ঘাসের প্রোটিন সিন্থেসিস করে ও তাতে দুটো অ্যামিনো-গ্রুপ জুড়ে দিয়ে হেক্সা-হাইড্রক্সি-ডাই-অ্যামিনো স্তরে এনে ঘাসকে খাদ্যপোযোগী করা। অর্থাৎ সরাসরি মানুষকে ঘাস না খাইয়ে তাকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের উপযোগী খাদ্য তৈরির এক অলীক আয়োজন। তারও প্রায় তিন দশক পরে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে রাজশেখর 'ঘাস' কবিতাটি লেখেন।[২২] ঘাস বিষ নয় ঠিকই, কিন্তু এটা মানুষের পাচনতন্ত্রের উপযোগীও নয়। তবু ব্যঙ্গ করেই রাজশেখর এই কবিতাটি লিখলেন। কারণ স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের প্রবল জোয়ারে তখন খাদ্য-সমস্যা এক বিকট আকার ধারণ করেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো হয়ত যায়, কিন্তু সে তো এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। সুতরাং খাদ্যাভ্যাস বদলানো বা বিকল্প খাদ্যের সন্ধান শুরু করার প্রয়োজন ছিল। অনেকে চেষ্টাও করছিলেন। সরকারি ব্যবস্থা তো সব

সময়েই অতি উৎসাহী। মূল কারণ বুঝতে না পেরে অবাস্তব খাদ্যের প্রস্তাব করে মন্ত্রীরাও মাঝে মাঝে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে কোনও রাজনৈতিক নেতার অভিভাষণের পটভূমিকায় রাজশেখর লিখলেন—

'আজ আমাদের আলোচ্য— Eat more grss
অর্থাৎ আরও বেশী ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য বলাধান,
দেদার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন,
ঘাসেই হবে অন্নসমস্যার সমাধান।'

কারণ, ঘাস খেয়েই যখন ছাগল ভেড়া তথা বাঘ শেয়াল সব জানোয়ারই তাগড়াই কেঁদো আর সন্তুষ্ট তখন মিছিমিছি ভাত ডাল মাংস ডিম দুধ ঘি আটা ময়দা খেয়ে লাভ কী?

৪

প্রত্যক্ষভাবে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে রাজশেখর তিনটি কবিতা লিখেছেন। প্রথমটি বাল্য রচনা। পরিণত বয়সে লেখা দ্বিতীয় কবিতায় তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে ব্যঙ্গ অবশ্যই আছে। কিন্তু ব্যঙ্গ করাই কবিতাটির উদ্দেশ্য নয়। বরং ঈশ্বর, ধর্ম, আস্তিকতা নাস্তিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে রাজশেখরের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার কিছুটা এই সব কবিতা থেকেই লক্ষণীয় আকার নিতে শুরু করেছে। রাজশেখর নিজে কী ছিলেন— আস্তিক না নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী না সংশয়বাদী, তাঁর লেখা থেকে এসব শনাক্ত করা সহজ নয়। কারণ তিনি নিজে সেভাবে কিছু লিখে যান নি। 'যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, তাঁদের মধ্যে নির্মল বসু ও সজনীকান্ত দাস রাজশেখরকে নাস্তিক মনে করতেন। আবার মনোরঞ্জন দাসের মত অন্যরকম।'[২৩] ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম সম্পর্কে তিনি কখনও উৎসাহ দেখাননি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মনে করেন: 'বাঙলায় হাতে-গোনা যে কজন লেখককে অনড় যুক্তিবাদী বলা যায়, পরশুরাম তাঁদের একজন।'[২৪] কারণ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই তিনি বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। আবার অপরের ধর্মাচরণে বাধাও দেননি। দৌহিত্রীপুত্র দীপংকর একটু বড় হয়ে সরস্বতী পুজো করেছেন, যে পুজোয় যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন পুরোহিত। পরিবারে অবশ্য স্ত্রী ও অন্যান্যরা পুজোআচ্চা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। বকুলবাগানের বাড়িতে কোনও ঠাকুরঘরও ছিল না। দীপংকরের স্মৃতিচারণে জানা যায় যে একটা কথা রাজশেখর অনেকবার বলতেন— 'দেখ, যা কিছু দেখচ, সব ভুল মিথ্যে মায়া। একমাত্র ব্রহ্ম সত্য এবং আমিই সেই ব্রহ্ম। এটা খুব মানি'।[২৫] অদ্বৈতবাদীর মতন রাজশেখরের এই কথা থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য করা শক্ত।

তবে তাঁর রচনায় দেবতা মুনি ঋষিদের যে ভাবে তিনি উপস্থিত করেছেন, তাতে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না— যেসব মুনি ঋষিদের লোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, গল্পের

প্রয়োজনে তো বটেই, নিজস্ব আগ্রহেও তাঁদের ব্যঙ্গ করার সুযোগ নষ্ট করতে চাননি তিনি। কিন্তু এর থেকেও তাঁর নাস্তিকতা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা তো আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গেই মিশে আছে। তবু কোনও কোনও চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত থেকে তাঁর ধার্মিক দৃষ্টিকোণের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এরকমই একটি চরিত্র জাবালি। 'জাবালি' গল্পে পরশুরাম জাবালির একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সমালোচকের মতে, 'রামায়ণ'-এর জাবালি ছিলেন সুবিধাবাদী; পরশুরামের জাবালি অজ্ঞেয়বাদী (অ্যাগনিস্টিক)। [২৬]

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস না থাকার কারণেই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও তাঁর অসাধারণ কোনও ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। 'রামায়ণ'-এর সারানুবাদকের মন্তব্য— 'শিশু যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও সেইরূপ পৌরাণিক অতিশয়োক্তি ও অসংগতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে পারি। এর জন্য ধর্মবিশ্বাস বা পূর্বসংস্কার একান্ত আবশ্যক নয়, উদার পাঠক সর্বদেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন।' [২৭] 'মহাভারত'-এর জগৎ সম্পর্কে সারানুবাদকের ধারণা— 'সকল দেশেই কুম্ভীলক বা plagiarist আছেন যাঁরা পরের রচনা চুরি করে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের বিপরীতই বেশি দেখা যায়। এঁরা কবিযশঃপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গুঁজে দিয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহু রচয়িতা ব্যাসের সহিত একাত্মা হবার ইচ্ছায় মহাভারতসমুদ্রে তাঁদের ভালো মন্দ অর্ঘ্য প্রক্ষেপ করেছেন।...কেউ কেউ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পাকা করার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিয়ে অনর্থক অলৌকিক লীলা দেখিয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম করিয়েছেন। কেউ সুবিধা পেলেই মহাদেবের মহিমা কীর্তন করে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ বা গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রত-উপবাসাদির ফল বা স্ত্রীজাতির কুৎসা প্রচার করেছেন, কেউ বা আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন।'[২৮] ভগবান সম্পর্কে পরশুরামের 'দীনেশের ভাগ্য' গল্পটি আমরা এ প্রসঙ্গে মনে করতে পারি। সেখানে গোলকের জবানীতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা ভগবানের ধারণা সম্পর্কে রাজশেখরের অবস্থান বলে মনে করলেও ভুল হবে না। বলা হয়েছে— 'হরেক রকম ভগবান আছেন, কতক মানি কতক মানি না। ঐতিহাসিক আর আধা-ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের ভগবান বলে মানি, যেমন বুদ্ধ, যীশু, আর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ। এঁরা করুণাময়, কিন্তু সর্বশক্তিমান নন।...করুণাময় আর সর্বশক্তিমান পরস্পর বিরোধী, সে রকম ভগবান কেউ নেই। মানুষের কোনও গুণ বা দোষ ভগবানে থাকতে পারে না, তিনি ভালোও নন, মন্দও নন, দয়ালুও নন নিষ্ঠুরও নন। তাঁর কোনও ইচ্ছা উদ্দেশ্য বা মতলব থাকা অসম্ভব। যে অপূর্ণ, যার কোনও অভাব আছে, তারই উদ্দেশ্য থাকে। পূর্ণব্রহ্মের অভাব নেই, কিছু করবারও নেই, তিনি স্থান কাল শুভ অশুভ সমস্তের অতীত।' [২৯]

'কজ্জলী' লেখার সমসাময়িক কালে রাজশেখর দেবতার উদ্দেশে দুটি কবিতা লেখেন—

একটি 'প্রার্থনা' এবং অন্যটি 'দেবনির্মাণ'। 'প্রার্থনা' কবিতা ও 'জাবালি' গল্প প্রায় একই সময়ে লেখা হয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কবিতাটি আশ্বিন এবং গল্পটি কার্তিক ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রার্থনা'-য় বিপুল নিখিলের অধিপতি নারায়ণের কাছে কবির আকাঙ্খা জানান হয়েছে। কবি দুর্দশায় আছেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও সে-সব দূর করার জন্য রাজ্য রাজকন্যা কুবেরের ধন স্বর্গের ভোগসুখ মুক্তি নির্বাণ কিছুই চাইবেন না— শুধুমাত্র যার জোরে অন্যান্য দেশ এত এগিয়ে গিয়েছে, চাইছেন সেই শক্তি।

খোল হে শীঘ্র খোল হে তোমার শক্তির ভাণ্ডার,
দাও হে মাথায় হৃদয়ে শক্তি বাহুতে শক্তি আর।

শুধু শক্তিলাভই নয়, তার প্রয়োগ সম্পর্কেও কবির সকৌতুক বাসনা—

দুর্জন অরি এক চড় যদি লাগায় আমারে কভু,
তিন চড় তারে কশাইয়া দিব, মাপ কর মোরে প্রভু।
একটি কানের বদলে তাহার দিব দুই কান কাটি,
একটি দাঁতের বদলে তাহার উপাড়িব দুই পাটি।

নিতান্ত বস্তুবাদী এই প্রার্থনার পাশাপাশি আমরা এই সূত্রে পরশুরাম সৃষ্ট জাবালি চরিত্রটিকেও একপলক দেখে নিতে পারি। স্ত্রী হিন্দ্রলিনীর ধারণায় 'তিনি (জাবালি) একটি সৃষ্টিবহির্ভূত লোক, কাহারও সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন।' আমরা আরও দেখি তিনি জপতপের পরিবর্তে শতদ্রুতীরে নিবিষ্টমনে মাছ ধরেন। অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে ভ্রষ্টাচারী উন্মার্গগামী নাস্তিক বলে মনে করলেও জাবালি বলেন— 'আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।'

মনে হয়, এগুলি শুধু জাবালির মুখের কথা নয়, 'কজ্জলি'-র সৃষ্টিকর্তা রাজশেখরেরও বিশ্বাস। কারণ পরবর্তীকালে লেখা 'প্রার্থনা' প্রবন্ধেও তিনি দেখিয়েছেন— 'সাধারণের ধারণা মাদুলি স্বস্ত্যয়নের মতন প্রার্থনারও শক্তি আছে। ... প্রার্থনাবাদীরা বলেন, যদি ডাকার মতন ডাকতে পার তবে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে লজিক বা স্ট্যাটিস্টিক্সের সম্পর্ক নেই।'[৩০] রাজশেখর প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও এগুলির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের তীর সর্বদাই নিক্ষেপ করেছেন। পরশুরামের লেখা থেকেই দুটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। 'মহেশের মহাযাত্রা'-য় আছে: 'তখন রাজনীতিচর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, ...লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত— বউ ভালোবাসে কি বাসে না। যাদের সে-সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা

ঘামাত— ভগবান আছেন কি নেই।' [৩১] যেমন, 'বিরিঞ্চিবাবা'-তেই দেখা যায়— "পরমার্থ চটিয়া উঠিয়া বলিল— 'দেখ সত্য, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে ফাজলামি ক'রো না। প্রার্থনাও যা মন্ত্রসাধনাও তা। মন্ত্রসাধনায় প্রচণ্ড এনার্জি উৎপন্ন হয় তা মান?' সত্যের জবাব— 'আলবৎ মানি। তার সাক্ষী রাজসাহির তড়িতানন্দ ঠাকুর, কলেজের ছেলেরা যাঁকে বলে রেডিও বাবা। বাবার দুই টিকি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। কাছে এগোয় কার সাধ্য— সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।"[৩২] ফলত অন্য এক ব্যঙ্গ দিয়েই শেষ হয় 'প্রার্থনা'—

'তার পরে যদি আসে হে সুদিন, আর যদি বেঁচে থাকি,
ভাল ভাল বর করিব আদায় যা কিছু রহিল বাকী—
মান সম্ভ্রম, মোটা রোজগার, চারতলা পাকা বাড়ি,
লোক-লশকর, রূপসী বনিতা, আট-সিলিন্ডার গাড়ি।।'

বাল্যরচনা ছাড়া রাজশেখরের পরিণত বয়সের যে কটি কবিতা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে 'দেবনির্মাণ'-ই একমাত্র সিরিয়াস রচনা (প্রকাশ: 'ভারতবর্ষ', বৈশাখ ১৩৩৪)। সমস্ত কবিতা জুড়ে তিনি তাঁর দেবতার নির্মাণ করছেন। নির্বিকার অবোধ্য বিধাতা বা গুণহীন পরমাত্মা নন, তিনি সর্বত্র সন্ধান করেন বহুশক্তিমান দেবতার, যিনি পুত্র ধন ধান্য ধেনু দিতে পারবেন, অমঙ্গল দূর করতে বা শত্রু সংহার করতে পারবেন। সেই দেবতাকে ধরবার জন্য কখনও অভ্রভেদী মন্দির তৈরি করেছেন, তাতে দৃশ্যমান মূর্তি তৈরি করে নানা আভরণে সাজিয়েছেন। আবার কখনও তাঁকে নিরাকার মনে করে শালগ্রাম শিলাতেই আবাহন করেছেন। সাধারণের কথায় কখনও মানুষকে দেবতা করেছেন, অনুরূপভাবে দেবতাকে মানুষ ভেবেছেন। কখনও বিশ্বাসের মাধ্যমে দেবতাকে লাভ করতে চেয়েছেন। বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস হয়ে উঠলে সব মঙ্গলই দেবতার দান মনে হয়েছে, মনে হয়েছে অমঙ্গল দেবতারই লীলাখেলা কিংবা ভক্তের কর্মফল। ভক্তি দেবতাকে আশ্রয় করলে যুক্তি তার বন্ধন কেটেছে। অবশেষে মনে হয়েছে বিধাতা দেবতাকে গড়তে না পেরে সেই দায়িত্ব ভক্তের ঘাড়ে ফেলে দিয়েছেন। ভক্ত হিসাবেই তাই কবি নিজের সমস্ত অভাব দেবতার মধ্যে মেটাতে চান, সমস্ত সৌন্দর্য দেবতায় আরোপ করতে চান— 'দেবোত্তম রচিবার ছলে নরোত্তমে দিতেছি আকার'। অখণ্ড মানসবিগ্রহের খণ্ড রূপই তিনি দেখেছেন এবং সেই খণ্ড-নারায়ণকেই প্রণাম করেছেন। সেই দেবতার সর্বশক্তি নাই থাক, তিনি উদ্ধার করতে নাই পারুন, তবুও তিনি বহুশক্তিমান, তিনিই করুণানিধান,

'নাহি হ'ক সর্বফলদাতা,
তবু তারে করিব দেবতা।।'

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, রাজশেখর তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত মহাকাব্য/কাব্য অনুবাদ করেছিলেন— বাল্মীকি 'রামায়ণ', কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত 'মহাভারত' এবং

কালিদাসের 'মেঘদূত'। অনুবাদগুলি গদ্যে হলেও সেই গদ্যে মূল কাব্যরসের কোনও অভাব ছিল না। রাজশেখর নিজেও বিশ্বাস করতেন, 'পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হ'ক, তা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মুল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব।'[৪৫] যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে কিছুটা পরিশ্রম করে কাব্যের রসগ্রহণ করতে চান, রাজশেখরের 'মেঘদূত' তাদের তৃপ্ত করবে। গদ্যে হলেও— সেই গদ্য যা শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যগুলিকেও প্রকাশ করতে সক্ষম।

৫

লেখক হিসাবে পরিচিত হবার পর আত্মীয়স্বজন, বিশেষত ছোটোরা অনেক সময়ে কবিতা বা অটোগ্রাফের আবদার করেছে রাজশেখরের কাছে। এগুলো যে তিনি খুব পছন্দ করতেন, এমন নয়। এমনকি অটোগ্রাফ সংগ্রহকে বদভ্যাসও বলেছেন। কিন্তু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাদের সে আবদার তাঁকে মেটাতেও হয়েছে। খুব কম হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি নিজের আবেগে বা কতর্বব্যবোধে প্রিয়জনের উদ্দেশে কবিতা লিখেছেন। সব রকম মিলিয়ে যে ক-টি লেখা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই আছে 'পরশুরাম গল্পসমগ্র'-এর কবিতাংশে।

এই শ্রেণীর একটি কবিতা 'দুলালের গল্প'। দুলাল রাজশেখরের শ্যালক জ্যোতিশের বড় ছেলে। প্রপিতামহ বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে, পৈতৃক বাড়িও বর্তমান শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে, যাকে সে সময় পটলডাঙা বলেই উল্লেখ করা হত। স্বল্পায়ু দুলাল আনুমানিক পনেরো/ষোলো বছর বয়সে টাইফয়েডে মারা যায়। কবিতাতেই দুলালের মা-বাবা-কাকা, ভাই-বোন, বেড়াল-সকলের পরিচয় দেওয়া আছে। নিজেকেও একবার দুলালচাঁদের 'ন-পিসেমশাই' এবং শেষে 'চার-নম্বর পিসে' বলে উল্লেখ করেছেন। ছোটোবেলাতে দুলাল কটকে সেজো পিসিমা পঙ্কজিনীর কাছে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য, শান্তিনিকেতনেও থাকতে হয়েছে পড়ার সময়, যা কবিতাতে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে থাকার কোনও এক সময় এটি লিখে দুলালকে উপহার দেন রাজশেখর। কবিতা পেয়ে উৎসাহের আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখায় দুলাল। আর রবীন্দ্রনাথও তখনই সেটি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-য় ছাপিয়ে দেন।[৩৩] এটি দুলালের কাল্পনিক কীর্তিকাহিনী উল্লেখ করে ছোটোদের জন্য লেখা কবিতা— যেখানে আছে দুলালের জন্য খাঁদা নাক মাস্টার—

বললে দুলাল— "আপনার সার নাকটা কেন খাঁদা?
আপনি যদি পড়ান আমার বুদ্ধি হবে হাঁদা।"

লম্বা নাক মাস্টার—

দুলাল বলে— "আপনার সার খাঁড়ার মতন নাক,

নাকের খোঁচায় শেষে আমার বুদ্ধি ছিঁড়ে যাক!"

এমন কী নাকের বালাই নেই এমন ব্যাং মাস্টারের কথা—

ব্যাং বললে— "আয় রে দুলাল পড়বি আমার কাছে।"

কোথায় দুলাল? লেপের ভেতর ঐ যে লুকিয়ে আছে।

এ ছাড়াও জুজুর সঙ্গে দুলালের বাগ্‌যুদ্ধে জুজুর হার মানার কথা এবং অবশেষে দুলালের জয়জয়কারের কথা। ব্যাং, জুজু ইত্যাদির কথোপকথনে গিরীন্দ্রশেখরের "লালকালো'-র কথা মনে পড়ে যায়।

'অটোগ্রাফ' (নামকরণ সম্পাদকের) নামে কয়েকটি কবিতা আছে যেখানে বিভিন্ন সময় অটোগ্রাফ-প্রার্থীদের ইচ্ছাপুরণ করেছেন রাজশেখর। কোথাও বাণীসহ সই-সংগ্রহকে কদভ্যাস বলেছেন—

'গাদা গাদা ফোটোগ্রাফ
গুচ্ছের অটোগ্রাফ...
শুকনো ফুল মরা প্রজাপতি
এ সব সংগ্রহ কদভ্যাস অতি।'

আবার কোথাও সই-শিকারীকে উৎসাহও দিয়েছেন—

'বাড়িয়া চলুক এই তোমাদের খাতা,
লেখাতে ছবিতে এর ভরে যাক পাতা।

এখানে অটোগ্রাফ পর্যায়ভুক্ত একটি দীর্ঘ কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে, নাম— "ছবি-মণিকে'। কবিতাটি ছবি ও মণিকে উপহার দেওয়া হয়েছিল বলেই প্রকাশের সময় একই শিরোনাম রেখে দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে তাদের ভালো নাম (মায়া ও স্নেহ চৌধুরি)। চাকরীসূত্রে অবসর গ্রহণের পরও বেঙ্গল কেমিক্যালের অধিকর্তা হিসাবে তাঁকে বছরে দু-একবার দিল্লী যেতে হত। সেখানে শ্যালিকা-কন্যা যুথিকার বাড়িতে দুই দৌহিত্রী ছবি (মায়া চৌধুরী) ও মণি (ড. স্নেহ চৌধুরী)-র আগ্রহে মণির খাতায় কবিতাটি লেখা হয়। সম্ভবত, কবিতাটি কলকাতায় লেখা হয়েছিল।[৩৪] মণি (নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপিকা) এবং ছবি দুজনেই অবিবাহিতা ছিলেন, বর্তমানে প্রয়াতা। কবিতাটি দাদু নাতনীর ব্যক্তিগত পরিহাসের সম্পর্কসূত্রে লেখা। তবে ব্যঙ্গে পরশুরামী শৈলীটাও যথেষ্ট লক্ষণীয়। রাবণ অটোগ্রাফ না দেবার জন্য নানা অজুহাত দেখালে নাতনীদ্বয় হনুমানের ঠিকানা চাইবে (কারণ তারা শুনেছে তিনি যেমন লড়িয়ে তেমনি লিখিয়ে), তখন—

"রাবন বলবেন— 'সব মিছে কথা,
তার ভারী তো ক্ষমতা।
টিকটিকির মতন ছিনে ছিনে হাত
তাতে হাজারটা মাদুলি আর গাঁটে গাঁটে বাত।

আহা কিবা লড়িয়ে, কিবা লিখিয়ে! রোগা নাদাপেট,
ব্যাটা ইল্লিটারেটা!"

রাবণের মুখে 'ইল্লিটারেট' শব্দের মজা অনেকটা 'গুরুবিদায়' গল্পের বালিগঞ্জী গুরু খল্বিদং স্বামীর মুখে 'শালা' শোনার মতন। [৩৫]

পরিচিত চরিত্রদের নিয়ে লেখা কবিতাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধহয় 'সতী', লেখা হয় ১৬ এপ্রিল ১৯৩৪। ঠিক তার একদিন আগে রাজশেখরের একমাত্র কন্যা প্রতিমা মারা গিয়েছেন। একই দিনে তার কয়েক ঘণ্টা পরে জামাতা অমরনাথও। অমরনাথ অসুস্থই ছিলেন, বাঁচার আশাও ছিল না। তাঁর আসন্ন বিয়োগের শোক সহ্য করতে না পারার আশঙ্কায় প্রতিমার মৃত্যু হল আগেই। দুজনের সৎকার হল একই চিতায় নিমতলা শ্মশানে। তখনকার সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যম খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল। একসঙ্গে জামাই এবং প্রিয় মেয়ের আকস্মিক মৃত্যু বাবার কাছে যে কতটা শোকাবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। শোকের প্রাবল্যে বা শোককে সংহত করার জন্যই হয়ত রাজশেখর সে দিনই 'সতী' রচনা করেন এবং পরের দিন সকালেই সেটি মাতৃহারা একমাত্র নাতনী আশার হাতে দিয়ে বলেছিলেন— 'লেখাপড়া নিয়ে থাকো। বিদ্যের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই।' [৩৬]

মৃত্যুকে জয় করা এক সাধ্বী স্ত্রীর জয়গাথা কবিতাটির বিষয়বস্তু, স্বয়ং যমরাজ যার পতিপ্রেমের কাছে পরাজিত। শুধু স্বামীর প্রতি ভালোবসাই নয়, সে নারী নিজেও মৃত্যু-বিজয়িনী। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র আঙ্গিকে লেখা এই কবিতার সঙ্গে রাজশেখরের অন্য কবিতার প্রভেদ লক্ষণীয়। স্ত্রীর কাছ থেকে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে নিয়ে যেতে রথ নিয়ে এসেছেন কৃতান্ত। সতী স্ত্রীকে পথ ছেড়ে দিয়ে মনকে শান্ত করতে বলছেন। তাকে নিশ্চিত করার জন্য জানাচ্ছেন—

'রথশয্যা মাতৃঅঙ্কসম সুকোমল ব্যাথাহীন শান্তিময় বিশ্রাম-নিলয়,
কোনো চিন্তা করিও না হে মমতাময়ী।'

সে চিন্তা করে না, বরং ছলনামূলক কৌতুকে রথে আরোহণ করে বসে—

'দৃপ্তস্বরে বলে সতী— 'চালাও সারথি,
বিলম্ব না সহে, বেলা বহে যায়।'

হতবাক যম সতীর ক্ষমতার কাছে পরাভব স্বীকার করে স্বামীর পরিবর্তে সতীকে নিয়েই অমরলোকে প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ চান।

'কহে সতী— 'ফিরে যাও আলয়ে আমার,
যার তরে গিয়েছিল আনো শীঘ্র তারে।'
কৃতান্ত কহিল— 'অয়ি মৃত্যু-বিজয়িনী,
নিমেষে যাইব আর আসিব ফিরিয়া।'

গল্পের আঙ্গিকে লেখা এই কবিতায় সতীর অশেষ ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস কারও নজর এড়াবে না। সেই কারণে আমরা এই প্রচেষ্টাকেই একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। 'চলন্তিকা'-য় সতী শব্দের অর্থ— সাধ্বী, নির্মলচরিত্রা, পতিব্রতা এবং (বাংলায়) স্বামীর সহিত যে সহমৃতা হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন সহমৃতার সঙ্গে অনুমৃতাও যোগ করেছেন। বর্তমান কবিতায় সতী শব্দের সঙ্গে নিঃসন্দেহে সহমৃতা বা অনুমৃতার কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ দু-জনকে এক চিতায় দাহ করা হলেও তা ছিল অনির্ধারিত। প্রতিমার মৃত্যু হয়েছিল স্বামীর মৃত্যুর আগে। সাধ্বী, নির্মলচরিত্রা, পতিব্রতা ইত্যাদি বিশেষণ তার নামের সঙ্গে প্রয়োগ করাই যায় এবং সধবা স্ত্রীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তখনকার প্রচলিত সামাজিক উচ্চ ধারণার একটা প্রভাব থাকতেই পারে। সেটা যদি আমরা নাও ধরি, কবিতাটি পড়লে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পতিবিচ্ছেদের সম্ভাব্য কষ্ট থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছায় স্বামীর মৃত্যুর আগেই প্রতিমা নিজের মৃত্যু চেয়েছিলেন। হতে পারে, এটা নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আধুনিক পাঠকের কাছে এটাই ভালোবাসা— পতিপ্রেম। এর সঙ্গে নিজেকে সতী প্রমাণ করার কোনও বাসনা আমাদের মনে আসে না। তাই অবাক লাগে ধর্ম ঈশ্বর সম্পর্কে বরাবরের উদাসীন যুক্তিসহ রাজশেখর কেন এখানে প্রেমের দৃষ্টিকোণটি উপেক্ষা করে সতীত্বের প্রতিষ্ঠার ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেন![৩৭] নিকট সম্পর্কের মৃত্যুর মতন বিপর্যয়ে কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বেশির ভাগ সময়েই বিহ্বল হয়ে পড়েন।[৩৮] সে ভাবেই, হয়ত রাজশেখরের মতন প্রাজ্ঞ সাহিত্যিককেও কখনো-কখনো আবেগতাড়িত হয়ে উঠতে হয়।

পরিচিত চরিত্রদের নিয়ে লেখা যে কটি কবিতা পাওয়া গেছে, তার শেষ রচনা 'দীপংকর'। রাজশেখরের দৌহিত্রী-পুত্র দীপংকর বসুর সতেরো বছরের জন্মদিনে এটি লিখে উপহার দেন দাদু। ঠিক কবিতা নয়— ধরণটা গদ্যের, যে কারণে শুরুতেই রাজশেখর জানিয়ে দেন—

> 'দীপংকর, তোমার জন্মদিনে
> ভেবেছেলুম একটা কবিতা লিখব।
> কিন্তু কিছুতেই হাত দিয়ে বেরুচ্ছে না
> তাই কবিতার বদলে গবিতা লিখছি!'

রচনাটি নেহাত ব্যক্তিগত। নাতির জন্মদিনে দাদুর স্মৃতিচারণ ও পরামর্শ। তাই কবিতা হিসাবে এটির আলোচনার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে কয়েকটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র তাদের পরিচয়গুলি দেখে নিতে পারি।[৩৯] ডাক্তার লক্ষ্মী হালদারের চড় খেয়ে সদ্যজাত দীপংকরের মুখে আওয়াজ ফোটে। এই লেডি-ডাক্তার দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ধারার অন্যতম প্রবক্তা রঙ্গীনচন্দ্র হালদারের ভগ্নী এবং ডা. মণি সরকারের সহকারী। সাহিত্যিক

ও সাহিত্যতাত্ত্বিক গোপাল হালদার (রঙিন হালদারের কনিষ্ঠ) ও তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আমার বোন লক্ষ্মীকে তিনি [রাজশেখরের স্ত্রী মৃণালিনী] বিশেষ স্নেহ করতেন।" দীপংকরের কাছাকাছি বয়সী আরও দু-জনের নাম আছে— এক শ্যালিকা (নলিনী)-পুত্র অরুণকুমার বসুর ছেলে গৌতম এবং ওই শ্যালিকারই অন্য পুত্র অরবিন্দ বসুর ছেলে গোরাচাঁদ, ভাল নাম অরূপ বসু। এরা সকলেই এসেছে কথপোকথনের মতন সহজ গদ্যে। ভাষা যে রকমই হোক, কিশোর নাতিকে দেওয়া প্রবীণ দাদুর পরামর্শের মধ্যে যথেষ্ট প্রাজ্ঞতা আছে—

'কালিদাস বলেছেন—

মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ;
অর্থাৎ বোকারা পরের বুদ্ধিতে চলে।
কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে যখন কুলোয় না
তখন পরের বুদ্ধি নিতেই হয়।
যদি তুমি চালাক হও
তবে মূর্খ humbug-এর মত নেবে না,
জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নেবে,
তা হলেই সিদ্ধিলাভ।'

৬

'পরশুরাম গল্পসমগ্র'-এর কবিতাংশের একত্রিশটি রচনা ছাড়াও তাঁর অসংখ্য টুকরো কবিতা ন'টি গল্প সংকলনে ছড়িয়ে আছে। সেগুলো বিভিন্ন ব্যঙ্গ গল্পের অংশ হিসাবে স্বতন্ত্র কবিতার চেয়েও পাঠককে আকর্ষণ করে বেশি। তাই অনুকূল পরিস্থিতি পেলেই পরশুরাম-পাঠক বলতে পারেন—

'পরের ধন লইবে না, তাহাতে বিপদ;
চোরের ধন লইতে পার, অতি নিরাপদ।' [ধনুমামার হাসি]

অনেকে তো অকারণে মনের আনন্দেই গেয়ে ওঠেন—

'সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে।
ঝমে ঝমে ঝাঁয় ঝাঁয়, ঝমে ঝমে ঝাঁয়।' [রাজমহিষী]

এই আলোচনার উপসংহারে যাবার আগে সে রকম কয়েকটি উদাহরণ আমরা দ্রুত দেখে নিতে পারি। কবিতা লিখুন বা নাই লিখুন, বহু সময় গল্পেও অসাধারণ কাব্যিক পরিবেশ তৈরি করেছেন পরশুরাম। যেমন, ভুশণ্ডীর মাঠের বর্ণনা—

'ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে

ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্‌র্‌ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদ্‌গদ স্বরে মাঝেমাঝে ক-অ-অ করিতেছে।'[৪০] [ভুশণ্ডীর মাঠে]

অশীরীরী-রোমান্সের ভূমিকা হিসাবে এই বর্ণনায় কাব্যগুণ যথেষ্ট অভিনব। একই ভাবে, 'লম্বকর্ণ'-এ দুর্যোগের বর্ণনাও যথেষ্ট কাব্যিক। গল্পে এই রকম কাব্যময় বর্ণনা ছবি-লেখা অবন ঠাকুরের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

মনে রাখা দরকার, পরশুরামের ন-টি গল্প-সংকলনের অধিকাংশ গল্পই ব্যঙ্গ গল্প। ফলে গল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কবিতাতেই কৌতুকের ছাপ স্পষ্ট। ভৌতিক কৌতুকের মাধ্যমে লেখা পরশুরামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'মহেশের মহাযাত্রা'। সেখানে গল্পের মূল চরিত্র অঙ্কের প্রফেসর এবং নাস্তিক মহেশ মিত্তির। মহেশ বন্ধু হরিনাথ কুণ্ডুর ওপর প্রচণ্ড রাগে কাব্যের কিছু না জেনেও কবিতা লিখেছিলেন।[৪১] কারণ দর্শনের প্রফেসর হরিনাথ ভূত দেখাবার অজুহাতে মহেশকে প্রতারণা করেন, অবশ্য কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়াই। তবু সেই আঘাতটা মহেশের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে মানসিক বিপর্যয়টা পদ্য হয়ে আছড়ে পড়ল। পরশুরামের ভাষায়— 'মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে।'[৪২] মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন, কিন্তু আজ কবিতার বেগ সামলাতে না পেরে আল্‌জেব্‌রা বই-এর প্রথম পাতাতেই লিখে ফেললেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

পদ্য ছন্দে লেখা দুটি সরল বাক্য দেখে আদি কবি বাল্মিকীর মত তাঁর নিজের রচনাও উত্তম মনে হল। এভাবেই ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই না মানা মহেশের হাতে যে কবিতা তৈরি হল তার কাব্যগুণ যাই হোক, কৌতুক রসের প্লাবনে পাঠককে ভাসিয়ে নেবার পক্ষে আদর্শ।

আবার 'দক্ষিণরায়'-এ চাটুজ্যেমশায়ের কবিতা পাঁচালির ঢং-এ লেখা। পাঁচালিতে যেমন লৌকিক দেবদেবীর অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদি বর্ণনার পর পাদস্পর্শ আশীর্বাদ ইত্যাদি প্রার্থনা করা হয়, এখানেও তেমনি বাবা দক্ষিণরায়ের পরিচয়, এলাকা, জ্ঞাতিগোত্র, খাদ্য ইত্যাদি বর্ণনার পর অভিনব প্রার্থনা করা হয়েছে—

'দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা।'

১৩৬২ বঙ্গাব্দের (১৯৫৫) শারদীয় দেশ-এ পরশুরামের 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পটি প্রকাশিত হল। এখানে বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবিতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে, কবি ধূর্জটিচরণের কাল্পনিক মানসী প্রিয়ার উদ্দেশে লেখা— 'ওগো সর্বনাশী, আমি ভালোবাসি তোমার ঠোঁটের ওই মোনালিসা হাসি' এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় লেখা ধূর্জটির স্ত্রী শংকরীর উদ্দাম লিবিডোমাখা কবিতা। চীনেম্যানের উদ্দেশে লেখা শংকরীর এমনই একটা কবিতা—

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
তুমি থাক মহাপ্রাচীরের এপারে।
কি মিষ্টি তোমার আধো আধো বুলি,
রুশকে বল লুশ, দু টাকাকে তু লুপি।
ওগো লাল চীনের জঙ্গী জওআন,
তোমার নয়ন বাঁকা, বর্ণ স্বর্ণচাঁপা,
সিল্কমসৃণ শ্যামায় লেদার তোমার চামড়া,
ওই নির্লোম বুকে ঠাঁই চাই ঠাঁই চাই।'

লক্ষণীয়, কবিতার পেছনে যে সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা আছে তার ভারসাম্যের অভাবই এই গল্পের বিষয়বস্তু। দাম্পত্যের সেই ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার পরেই ধূর্জটি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে সরল বীজগণিত রচনা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শংকরী রবিবারের কাগজে কাঁকড়ার কচুরি, পেঁয়াজের পায়েসের মতন রান্নার রেসিপি লেখা স্থির করে।

'নীল তারা' গল্পেও রাখাল মুস্তৌফী তার প্রেমিকাকে ফিরে পাওয়ার অনুভূতি ছাত্র নারানের কাছে কবিতাতেই প্রকাশ করে....

'বরষে ধারা, ভূমি শীতল,
তাপিত তরু পেয়েছে জল;
টানিছে রস তৃষিত মূল,
ধরিবে পাতা ফুটিবে ফুল।'

আর এর পরেই রাখালের প্রশ্নে পরশুরামের অন্তিম ব্যঙ্গ— 'তোদের হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন পারে এমন লিখতে?'

৭

এই সব নিয়েই রাজশেখরের কবিতার জগৎ এবং তার বিস্তৃতি। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যচর্চার সবকটি পর্যায়েই তিনি কবিতা লিখেছেন— কখনও কবিতা চর্চার জন্য, কখনও অন্যের আবদারে বা অনুরোধে এবং অনেক সময়েই তাঁর ব্যঙ্গ গল্পের প্রয়োজনে। কবিতাগুলি সোজাসাপটা ভাষায় আমাদের বোধের সীমানায় ঢুকে পড়ে, অনুভূতিকে স্পর্শ করে এবং সেগুলির ব্যঙ্গ ও কৌতুক তৃপ্ত করে রসানুভবকে। কবিতায় ভাষা ও উপস্থাপনা নিয়ে তিনি

যে অনেক পরীক্ষা করেছেন, এমন নয়। কারণ এগুলিতে তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তবে নিজের লেখার ক্ষেত্রে আগ্রহ না থাকলেও এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা কম করেননি। তাঁর কথায়— 'অনেক আধুনিক লেখক নূতনতর সাংকেতিক ভাষায় কবিতা লিখছেন। এই বিদেশাগত রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলছে, অধিকাংশ পাঠক এসব বুঝতে পারেন না, অন্তত আমি পারি না। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হত না। আর cubism আর sur-reliasm-এর তুল্য এই সংকেতময় কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রলাপ, না অনাস্বাদিতপূর্ব রসসাহিত্য? বোধ হয় মীমাংসার সময় এখনও আসেনি।'[৪৪]

রাজশেখর এ নিয়ে সুস্থ বিতর্ক চেয়েছিলেন। সিদ্ধান্তর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। অপেক্ষা করাই যায়। কারণ প্রায় পাঁচ দশক পরে শঙ্খ ঘোষও লক্ষ করেছেন— "কবি তাঁর কবিতা লিখতে লিখতে এগোন, ... তাঁর কবিতা থেকে জটিল একটা শিল্পতত্ত্ব কেউ আবিষ্কার করে নেবেন, এমন কখনো হতেও পারে।... কিন্তু কবির নিজের কাছে এ কোনো সমস্যা নয়। তাই, 'আমি কীভাবে লিখব, কী লিখব, কাকে বলে কবিতা', কবির কাছে এসব প্রশ্নের একটাই মাত্র উত্তর যে, 'আমি যা লিখব সেটাই কবিতা। কোনো পূর্বসূত্র হতে পারে না কবিতার।"[৪৫] আর যদি পূর্বসূত্র নাই হয়, এমন কী পূর্বশর্তও না থাকে, তবে রাজশেখরের কবিতাকে তাঁর গল্পের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে না দেখে স্বতন্ত্র সৃষ্টি হিসাবে দেখাই ভালো। আমরা ধরে নিতেই পারি, এগুলো রাজশেখর বসুর কবিতা, তাঁর ঘরানারই সৃষ্টি স্বতন্ত্র মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

১. শঙ্খ ঘোষ: কবিতালেখা কবিতাপড়া, ২য় সং। রক্তমাংস, ১৯৯৯, পৃ.৯৩।

২. 'বাল্যের কবিতা বাদ দিলে চাকরির সময়ে বিজ্ঞাপন লেখাই আমার সাহিত্যের হাতেখড়ি।' পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পা. দীপংকর বসু। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, নতুন সং, ২০০৩। 'চলন্তিকা'-য় রাজশেখর 'বাল্য'-এর অর্থ করেছেন— ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়ঃক্রম।

৩. শঙ্খ ঘোষ: কবিতালেখা কবিতাপড়া, ২য় সং। রক্তমাংস, ১৯৯৯, পৃ.৩১।

৪. 'যখন দরভঙ্গায় এলাম তার (রাজশেখর) বয়স তখন সাত আন্দাজ।' শশিশেখর বসু : যা দেখেছি যা শুনেছি, ৩য় সং। মিত্র ও ঘোষ, ২০০৫, পৃ. ১৩৫।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭।

৬. স্বাভাবিকভাবেই সুনীতি চট্টোপাধ্যায় 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার রাজশেখর সংখ্যায় লিখেছিলেন— 'রাজশেখর পরিণত বয়সেই সাহিত্যরঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন।' এর প্রতিবাদ করেন শশিশেখর— "সাহিত্যরঙ্গ ১৮৯৩ সালেই শুরু হয়েছিল, সুনীতিবাবুকে জানাই। বাংলা গল্প লেখার আগে রাজশেখর অন্যান্য ইংরেজি ম্যাগাজিনে লিখত। একটা মনে পড়ে 'দ্য টিউবয়েল'। কলম একেবারে ঘুমিয়ে ছিল না।" (প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১)। তবে শশিশেখরের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে রাজশেখর ১৯২২-এর আগে সক্রিয়ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নি।

৭. রাজশেখরের প্রতি সরোজিনীর শ্রদ্ধাভক্তির একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শশিশেখর— "তখন এফ এ পাস করেছে তার দেওর। সে খেয়ালে রাজশেখরকে মা সরস্বতী দেখতে লাগল। এর পূর্বে সে চৌদ্দ বৎসর বয়সের দেবরকে একদিন শাড়ি পরিয়ে গহনা পরিয়ে দেখেছিল যে সে দেবর না বাণী বিদ্যাদায়িনী, বিদ্যার প্রতীক। রাজশেখর চুপ করে ছিল। সায়েন্টিস্ট কখনও কি এক্সপেরিমেন্টে আপত্তি করে?"

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯।

১২. পাঁচ বোনের মধ্যে ইন্দুমতী দত্ত, কুমুদবতী মুস্তোফী, উষাবতী সোম ও লীলাবতী ঘোষ রাজশেখরের বড় এবং হিরণ্যবতী দত্ত ছোট। এঁদের মধ্যে দু-জন বৈধব্যের কারণে বাপের বাড়ি, অর্থাৎ ১৪ নং পার্শীবাগানে অন্যান্য ভায়েদের সঙ্গেই থাকতেন।

১৩. https://www.adnax.com/poems/pbs02.htm

১৪. শশিশেখর বসু: যা দেখেছি যা শুনেছি, ৩য় সং। মিত্র ও ঘোষ, ২০০৫, পৃ.১৪০।

১৫. https://www.poetryfoundation.org/poems/45140/stanzas-written-in-dejection-near-naples. প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথও শেলির এই কবিতাটি 'সিন্ধু তীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' শিরোনামে অনুবাদ করেছিলেন। আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে: "আসিব ঘুমের মতো মরনের কোলে,/ধীরে ধীরে হীম হয়ে আসিবে কপল। সাগরের/মিশাইবে পলে পলে/ মুমূর্ষু শ্রবণতলে/অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল,"— শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সম্পা: সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত। নতুন সাহিত্য ভবন, ১৩৬৯, পৃ ২৩৭-২৩৯।

১৬. রাজশেখর পত্নী মৃণালিনী প্রায়ই বলতেন: '... বড় ধড়িবাজ। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। কিন্তু তাদের হাড়হদ্দ জানে।'— দৌহিত্রীপুত্র দীপংকর বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৭. শশিশেখর আরও লিখেছেন— 'চল এখন শ্বশুরবাড়ি— পৈরাগ, কর্ড মেলে, বয়লার ফাটে ফাটুক। সেখান থেকে রাজশেখর ও অন্যান্য ভাইবোনদের কর্ড মেলের টিউন লিখে চিঠি দেব দরভঙ্গায়।' যা দেখেছি যা শুনেছি, ৩য় সং। মিত্র ও ঘোষ, ২০০৫, পৃ. ১৩৭।

১৮. https://www.rodneyohebsion.com/mulla-nasrudin.htm

১৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৪৫৯।

২০. দশ বছর পরে (১৯৫৯) এই কথাগুলোই আরও স্পষ্ট করে বললেন রাজশেখর তাঁর ধর্মশিক্ষা প্রবন্ধে— 'আমাদের দেশে সব রকম দুষ্কর্ম আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। চুরি ডাকাতি প্রতারণা ঘুষ ভেজাল ইত্যাদি দেশব্যাপী হয়েছে, অনেক রাজপুরুষ আর ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কর্মে অসাধুতা প্রকট হয়েছে, জননেতাদের আচরণেও অসংযম আর গুণ্ডামি দেখা দিয়েছে, ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েছে।' রাজশেখর বসু: প্রবন্ধাবলী, চতুর্থ সং। মিত্র ও ঘোষ, ২০১০, পৃ. ৩১৫।

২১. প্রাগুক্ত।

২২. তখন 'সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা'-র প্রস্তুতি চলছে। সেই সংকলনের জন্য সম্পাদক

কুমারেশ ঘোষ রাজশেখরের কাছে একটি কবিতার অনুরোধ করেন। রাজশেখর সঙ্গে সঙ্গেই লিখে দেবার জন্য কাগজ-কলম এনে ইজিচেয়ারে বসে প্রাণপণে কবিতাটি মনে করবার চেষ্টা করলেন। খানিক পরেই বললেন, 'নাঃ ঠিক মনে আসচে না। আপনাকে পরে পাঠিয়ে দেবো।' তিন দিনের দিন ডাকে এলো তাঁর অভিনব কবিতা 'ঘাস'। (ষষ্টি-মধু, পরশুরাম স্মৃতি সংখ্য, বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ.৫৮)। এই মনে করার চেষ্টা দেখে বোঝা যায়, কবিতাটা সম্ভবত আগেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশের জন্য কোথাও দেওয়া হয়নি। তিনি সেটিকেই মনে করে কপি করার চেষ্টা করছিলেন এবং সেই মুহূর্তে বিফল হয়ে পরে মনে করে লিখে পাঠিয়ে দেন।

২৩. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী: পরশুরামের প্রবন্ধ। কোরক, বইমেসা ১৪০১, পৃ.১৩৯।

২৪. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: পরশুরাম গল্পকার। অবভাস, ২০১১, পৃ. ৫৭।

২৫. দীপংকর বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রহ্ম নিয়ে দীনেশের ভাগ্য গল্পে পরশুরাম (গোলকের জবানীতে) যদিও বলেছেন, তিনি একাধারে জ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একটি নগণ্য কণা এই পৃথিবী, তারই একটা অতি নগণ্য কীটাণুকীট আমি, ব্রহ্মের স্বরূপ এর চাইতে বেশি বোঝা আমার সাধ্য নয়', তবু সেই পরশুরামই 'গুরুবিদায়' গল্পে ব্রহ্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি— বংশোলোচনবাবুর স্ত্রী মালিনী দেবীর সম্ভাব্য গুরু উদাস উদাস সুন্দর চেহারার বালিগঞ্জের খল্বিদং স্বামী হপ্তা-খানেকের জন্য সম্ভাব্য শিষ্যার বাড়ি জাঁকড়ে থাকার তৃতীয় দিনে বংশোলোচনবাবু দেখলেন,খল্বিদং-এর চিবোনো আকের ছিবড়ে মালিনী পরম ভক্তি সহকারে চুষছেন। বংশোলোচন স্বামীজির বাণী স্মরণ করলেন— সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এ সমস্তই ব্রহ্ম— কিন্তু মন প্রবোধ মানল না। 'ব্রহ্ম নিখিল চরাচরে থাকিতে পারেন, কিন্তু আকের ছিবড়ায় থাকিবেন কোন্ দুঃখে?'

২৬. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: পরশুরামের চরিত্রশালা। অবভাস, ২০১১, পৃ.৩৭।

২৭. রাজশেখর বসু, সারানুবাদ: বাল্মীকি রামায়ণ, এম.সি.সরকার, ১৩৫৩, ভূমিকা [পৃ.৬]।

২৮. রাজশেখর বসু, সারানুবাদ: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত। এম.সি.সরকার, ১৩৫৬, ভূমিকা [পৃ.৭]।

২৯. রাজশেখর বসু: পরশুরাম গল্পসমগ্র। এম.সি.সরকার, ২০০৩, পৃ.৭১৬।

৩০. রাজশেখর বসু: প্রবন্ধাবলী, ৪র্থ সং, ২০১০, পৃ.৮৫। 'দীনেশের ভাগ্য' গল্পেও পরশুরাম এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন— 'জয়গোপাল বলিলেন, তর্ক করলে শ্রীকৃষ্ণ বহু দূরে সরে যান, বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি কৃপাসিন্ধু মঙ্গলময়। আমরা জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র প্রাণী, তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের অসাধ্য। শুধু এইটুকুই জানি, তিনি যা করেন তা জগতের মঙ্গলের জন্যেই করেন। কান্তকবি তাই গেয়েছেন— জানি তুমি মঙ্গলময়, সুখে রাখ দুঃখে রাখ যাহা ভাল হয়।' রাজশেখর বসু: পরশুরাম গল্পসমগ্র। এম.সি.সরকার, ২০০৩, পৃ.৭১৫।

৩১. রাজশেখর বসু: পরশুরাম গল্পসমগ্র। এম.সি.সরকার, ২০০৩, পৃ.২১৬।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৩৩. দীপংকর বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৩৪. দীপংকর বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৩৫. রাজশেখর বসু: পরশুরাম গল্পসমগ্র। এম.সি.সরকার, ২০০৩, পৃ. ২১০।

৩৬. দীপংকর বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৩৭. অবশ্য প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে রাজশেখরের পরিষ্কার মতামত জানা খুব সহজ নয়। সমালোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ঠিকই লক্ষ করেছেন: 'রোমান্টিক প্রেমের গল্প পরশুরাম একটিও লেখেন নি।' [রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: পরশুরামের চরিত্রশালা। অবভাস, ২০১১, পৃ.১০] পরশুরামের 'রাজমহিষী' গল্পে চকোরীর একটি সংলাপও আছে—'অক্ষয় প্রেম একটা বাজে কথা'।

৩৮. সকলেই বুদ্ধদেব বসু নন, যে কোনও মৃতাকে উদ্দেশ্য করে লিখতে পারবেন— "'ভুলিবো না'— এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে/জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।" বুদ্ধদেব বসু, সম্পা: আধুনিক বাংলা কবিতা, ৫ম সং, ১৯৭৩, পৃ.১৪৯।

৩৯. নামগুলির পেছনে চরিত্রদের পরিচয় জানিয়েছেন দীপংকর বসু।

৪০. প্রসঙ্গত, পরিবেশটি প্রকৃত ভৌতিক করার জন্য, বর্ণনায় যে সব পরিবর্তন প্রয়োজন, তাও করা হয়েছে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময় ছিল— 'সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইতেছেন', অর্থাৎ সূর্যাস্ত হয় নি— বিকাল। সেটাই বদলে 'গড্ডলিকা'-র প্রথম সংস্করণে হল—'সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন,' অর্থাৎ সন্ধ্যা হয়েছে। 'ভারতবর্ষ'-র শিমুলগাছ গড্ডলিকা-য় আকন্দঝোপ হয়েছে। 'ভারতবর্ষ'-এ একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়ে 'তারার মত' শিবুর গায়ে পড়ছিল—তারার মত বদলে হল মাকড়শার কঙ্কালের মত'।

৪১. কবিতার সূত্রেই হরিনাথ কুণ্ডু নামটি সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্প সংকলন (১৩৪৪)-এর এই নামটি কিন্তু প্রবাসী পত্রিকা (আষাঢ় ১৩৩৮)-র প্রথম পাঠে ছিল না— তখন চরিত্রটির নাম ছিল সাতকড়ি কুণ্ডু। যেহেতু বন্ধুকে আঘাত করার জন্য তার নাম নিয়েই কবিতা লেখা, তাই প্রবাসী-র প্রথম পাঠের কবিতায় সর্বত্র সাতকড়ি নামটিই ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন 'কুণ্ডু সাতকড়ি/মুণ্ডুপাত করি' বা 'ওরে সাতকড়ে,/হবি তুই মরে/নরকের পোকা/অতিশয় বোকা', ইত্যাদি। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় চরিত্রের নাম পরিবর্তন হলেও কবিতার গঠনে কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয় নি— শুধুমাত্র অন্তমিলের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু ছাড়া।

৪২. রাজশেখর বসু: পরশুরাম গল্পসমগ্র। এম.সি.সরকার, ২০০৩, পৃ.২১৯।

৪৩. রাজশেখর বসু: কালিদাসের মেঘদূত। এম.সি.সরকার, ১৩৬৯, ভূমিকা। এ ব্যাপারে 'মেঘদূত'-এর আরেক অনুবাদক বুদ্ধদেব বসুর স্বীকারোক্তি— 'ছাত্রাবস্থার পরে, আমি তাঁর [রাজশেখর বসুর] সংস্করণেই প্রথম মেঘদূত পড়ি এবং একবারের পর বার-বার পড়ার উৎসাহ পাই।'

৪৪. রাজশেখর বসু: প্রবন্ধাবলী, চতুর্থ সং, ২০১০, পৃ. ৯২।

৪৫. শঙ্খ ঘোষ: কবিতালেখা কবিতাপড়া, ২য় সং। রক্তমাংস, ১৯৯৯, পৃ.৩২।